প্রিয় ১৫ গল্প

পাপড়ি রহমান

ঐতিহ্য

কবি পিয়াস মজিদ
স্নেহভাজনেষু

গ ল্প ক্র ম

ঘুম ও স্বপ্নের মাছরাঙা পাখি ৯
মধ্যরাতের ট্রেন ২১
শোধ ৩১
চরভদ্রাসনে পরিকাহিনি ৪১
উৎসব ৪৮
কুমুদ ও ঢেউয়ের সংহরণ ৬০
দূর্বাঘাস, টিনের ঘের এবং অলকানন্দা ৬৭
ফকিরচানের শীতঘুম ৭৩
হলদে ফুলের বিকেল ৮২
দয়ালহরির আত্মরক্ষা ৯৩
পাতার পাহাড়, রক্তবর্ণ হিম ১০৪
আর উষ্ণ বয়সী ব্ল্যাকবোর্ড ১০৪
মঙ্গাক্রান্ত আকালুর মাছসমাচার ১১৫
উড়ন্ত গিরিবাজের ইন্দ্রজাল ১২৪
উজানি মাছেদের বউজীবন ১৩৪
হাওয়াকলের গাড়ি ১৪১

ঘুম ও স্বপ্নের মাছরাঙা পাখি

ছোরমান শেখ কুয়ার ওপর আরেকটু ঝুঁকে দাঁড়াল। কুয়ার জল প্রায় নাক ছুঁই ছুঁই করছে। জলের অমোঘ-ঘূর্ণি যেমন চারপাশের সবকিছুকেই নিজের কেন্দ্রের দিকে টানতে থাকে, ছোরমান শেখের নমিত মুখটাও ধীরে ধীরে কেন্দ্রাভিমুখে নেমে যাচ্ছিল। মাঝারি মাপের মাছটি এমন সময় ধপাস করে ছোরমান শেখের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল। আচানক শীতল স্পর্শ! ছোরমান শেখের সমস্ত শরীর ভয়ানক শিরশির করে উঠল। এতক্ষণ একটা গা ঘিনঘিনে কেঁচো মেরুদণ্ড বেয়ে বেয়ে উপরে উঠছিল। মাছটি পড়ার পর তা ঘাড়ের কাছে পিলপিলাতে লাগল। তীব্র অস্বস্তিতে ছোরমান শেখের নমিত মুখ হঠাৎ টান টান হয়ে ভরা জলের অস্পষ্ট আয়নায় অনড় হয়ে রইল। ঠান্ডা স্পর্শ, স্নায়বিক ঘিনঘিনে কেঁচো, ভয় ইত্যাদি ঝেড়েফুঁড়ে ছোরমান শেখ সোজা হয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে মনোয়ারার বাজখাঁই কণ্ঠস্বরে জলের আয়না থরথর করে কেঁপে উঠল।

'বুইড়া ছ্যাদর কত! খালি খাওন আর খাওন! খাওনের নামে দুনিয়ার লোল ফালায়। এত যে খান তাও আইশ মেটে না। নিত্য নিত্য রঙ্গ শুরু করছেন, না! মাইনষের কাছে মাইগ্যা খাইতে শরম করে না। কই ফকির অইছেন না। তাই যুদি না অইবেন তয় নিজের লালোচের কথা মাইনষেরে কইলেন কেমনে।'

মনোয়ারার পুঞ্জীভূত ক্ষোভ কণ্ঠস্বরে ফেটে পড়ছিল। বাঁশের কঞ্চিতে বসা কাক দুটো বিকট চিৎকারে দিশেহারা হয়ে একসাথে উড়াল দিল। এবার বসল অন্য বাঁশের কঞ্চিতে। কাঁচা বয়সী কঞ্চি কাক দুটোর সামান্য ভরেই কুয়ার ওপর অনেকখানি হেলে পড়ল। কাকের ভরে কঞ্চির নমনীয় দৃশ্যের একমাত্র দর্শক এখন ছোরমান শেখ। অবশ্য দর্শক না-হয়ে উপায়ও নেই। কারণ তার পা দুটো কে যেন মাটির গভীরে গেঁথে দিয়েছে। জমে যাওয়া পা দুটো শত চেষ্টাতেও একতিল নড়াতে পারল না। উপায়ান্তহীন ছোরমান শেখ

বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার লজ্জায় জলের কম্পমান আয়নায় আবার ঝুঁকে দাঁড়াল। শব্দের নিনাদে জলে মৃদু-ঢেউ উঠছিল। ঢেউয়ের দোদুল্যমান খেলায় ছোরমান শেখের প্রতিবিম্ব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। জলের আয়না শব্দের কাঁপনে চূর্ণ হয়ে শেখের অপসৃয়মাণ প্রতিবিম্ব কুয়ার পাতে লেপ্টে রইল।

ভাঙা ঢেউ ধীরে ধীরে থুম ধরলে ছোরমান শেখের ঘোলা চোখের তারায় ভেসে উঠল কাঁচাপাকা জটা দাড়ি, সাদা রুখু চুল এবং থেবড়ানো চেহারা। থেবড়ানো চেহারার দিকে চোখের পাতা টেনে পলকহীন তাকিয়ে মন উদাস হলো। পায়ের কাছে রুইমাছটি তেমনি চিতপাত পড়ে আছে। মনোয়ারার তিক্ত গলায় আবার খিস্তির-খই ফুটল—

'হাভাইত্যা বুইড়ার মরণ নাই! আমারে জ্বালাইয়া শ্যাষ করল। বউখাগি বুইড়া ভাম! আল্লায় যে এই আপদ কবে তুইল্যা নিব, কে জানে।'

মনোয়ারা যত তাড়াতাড়ি বুড়াকে পরপারে পাঠানোর জন্য ঠেলুক না কেন, আজ অন্তত তার কোথাও যাওয়া হবে না। তরতাজা মাছের সালুন, আউশের লাল-ভাত পেটে না-ঠেসে সে আজ কোথাও যেতে পারবে না। যাওয়া না যাওয়ার জটিল ভাবনা মাথায় নিয়ে ছোরমান শেখ সন্তর্পণে কুয়াতলা থেকে সরে এল। ঘরের ডুয়ায় শেকড়-ডোবানো-সেগুন আকাশচারী হয়ে আছে। সেই আকাশবৃক্ষের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ঝুলো চামড়ায় ঢেকে পড়া চোখ দুটো যতটা সম্ভব টেনে বের করে আকাশের দূরত্ব পরিমাপ করতে চাইল। কিন্তু তার পক্ষে সম্ভব হলো না। সেই ব্যর্থতা ভুলতে সে মনোয়ারার গতি-ভঙ্গিমা লক্ষ করতে লাগল।

মাছটার লেজ ধরে তুলে নিয়ে মনোয়ারা পিঁড়ি পেতে বসল। অভ্যস্ত হাতে একফ্যাসে ধড় থেকে মাথা নামিয়ে দিল। বঁটির বুক বেয়ে কালচে রক্ত মাটির ভিজে ভাবটাকে আরো বাড়িয়ে তুলল। মাছ কাটা হলে আঁশ, আতুড়িভুতুড়ি ছুড়ে ফেলল। কয়েক গজ দূরে ঢালু জমিতে থপ করে পড়ল। ঢালু জমির নান্দনিক কোমরজুড়ে বাঁশের এলোমেলো ঝাড়। কঞ্চিগুলো হাত-পা ছড়াতে ছড়াতে কুয়ার অনেকখানি দখল করে নিয়েছে। দিশেহারা কাক দুটো বসে ছিল তারই একটিতে।

ছুড়ে দেওয়া আবর্জনার ওপর কাক দুটো এবার নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আতুড়িভুতুড়ি, মেটে নিয়ে তারা এক মজাদার খেলায় মেতে উঠল; অনেকটা আপসমূলক মল্লযুদ্ধের মতো। ঘুরে ঘুরে খাবারে ঠোকর দেওয়া। কারো যেন খুব একটা দায় বা আগ্রহ নেই। ঝগড়াবিবাদ করার প্রবৃত্তিও নেই। খাদ্যের চারপাশে নেচে নেচে অনেকটা যেন খেলাচ্ছলেই নিজেদের ভাগ বুঝে

নেওয়া। কাক দুটোর অভিনব খাদ্যবণ্টন মনোয়ারা মোটেই খেয়াল করল না। আসলেই সে মনোযোগী হয়ে মাছ কুটছিল। বেজার মুখে মাছের গাবদা গাবদা টুকরোগুলো গুনে গুনে দেখল। এবার তার মুখে সামান্য প্রসন্নতার আভা ফুটল—

'যাইক, আইজ দুই বেলা খুব ভালোমতন চলব।'

মালশাভরা মাছের টুকরো নিয়ে মনোয়ারা কুয়ার কাছে দাঁড়ালে তখনো প্রসন্নতা অপরিবর্তিত ছিল। গুনগুন করে সুর ভেঁজে কুয়োর জলে দড়ি বাঁধা লোহার বালতি নামিয়ে ঝটপট তুলে আনল জল। এর পরের দৃশ্য ছোরমান শেখ না-দেখেই বলে দিতে পারে, মনোয়ারা মালশার পেটে মাছ ঘষবে। এই যত্নের ঘষাঘষিতে মাছের বদবু অনেকখানি ঝরিয়ে দেবে। লীলাবতীর পালা গাইবে। খলবলে পানিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে মাছের স্বাদ বাড়িয়ে তুলবে বহুগুণ। মিঠে-সুর বাঁশের পাতার শিরশির ধ্বনির সঙ্গে মিশে এক অপার্থিব সংগীতের জন্ম দেবে। যে সংগীতে মনোয়ারার চণ্ডাল মেজাজ ধীরে ধীরে ভেসে যাবে অনেক দূর।

নিশীথে নিদ্রার ঘোরে ছিলাম অচেতন।
অঞ্চল খুলিয়া চোরে নিয়াছে রতন॥
সে রত্ন খুঁজিয়া আমি ঘুরিয়া বেড়াই।
এমনি দুঃখের নিশি কান্দিয়া পোহাই॥
কান্দিতে কান্দিতে মোর অন্ধ হইল আঁখি।
কোন দেশে উইড়া গেল আমার পিঞ্জরের পাখি॥
এমন নিষ্ঠুর বিধি নাহি দিল পাখা।
উড়িয়া বন্ধের সঙ্গে করিতাম দেখা॥

ছোরমান শেখের আর তর সয় না। উত্তপ্ত রোদের থাবা সেগুনের পাতাপল্লব দুমড়ে দিচ্ছে। ছাতার মতো বিশাল ছায়াটা সরে যাওয়াতে চান্দির তেলটুকু দু'কানের পাশ দিয়ে গলে গলে নামছে। শেখের এখনও ঢের কাজ পড়ে আছে। ভালোমন্দের আয়োজন দেখলেই নিজের যত্নের বহর বেড়ে যায়। গা ডলে না-নাইলে খিদেটাও যেন মিইয়ে থাকে। সকাল থেকে মনোয়ারার মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। সে আজ কোনমতেই শ্বশুরকে নাওয়ার জল তুলে দেবে না। কী আর করা। তালাপই এখন শেষ ভরসা।

সেগুনের বড় বড় পাতার পিঠে রোদ ভালোরকম চড়ে বসলে ছোরমান শেখ ডুয়ার কাছ থেকে সরে এল। চারখানা জংধরা টিন ত্যারছা করে ফেলে

ঘরের বারান্দা। বারান্দায় নামাজের জন্য জলচৌকি পাতা। রোদবৃষ্টির মনমেজাজের নিচে পড়ে চৌকির পায়াগুলো নড়বড়ে। একচিলতে বাসনাসাবান চৌকির তলে সবসময় লুকিয়ে রাখে শেখ। দিন পাঁচেক আগেও তা দিয়ে ফুরফুরে গোসল সেরেছিল। এখন সেই অবশিষ্ট আঁতিপাঁতি করে খুঁজে মরছে। না, কোথাও নেই। কোন ভেলকিবাজিতে যেন হাওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই দুলুমিয়ার কাজ। সাবান সামনে পেলে আর রক্ষে নেই। দুই হাতে ভালোমতন সাবান ফেনিয়ে ফুঁ দিয়ে বেলুন বানাবে। সাবানের বেলুন দৈর্ঘ্য-প্রস্থে খুব বেশি না-বাড়তেই বাতাস তাকে টুটাফাটা করে বেরিয়ে যায়। কিন্তু দুলুমিয়া হেরে যাওয়ার পাত্র নয়। সে আবার বেশ করে দুহাতে সাবান মাখাবে। এক ফুঁয়ে বেলুন ফুলে উঠবে। আবার শূন্যে মেলাবে। আবার ফুঁ দেবে।

সময়মতো হাতের কাছে সাবান খুঁজে না-পেয়ে শেখের মনটা দমে গেল। তার এই এক বদভ্যাস। ভালোমন্দ রান্নাবান্না হলে নিজেকেও সেদিন সে পরিপাটি রাখতে চায়। নিজের গা-গতরেও যেন বিশেষ খেয়াল পড়ে। দিনের অনেকটা সময় তখন সে নিজের জন্য অপচয় করতে ভালোবাসে। ঝিঙার-ছোবায় সাবান মেখে ঘষাঘষি করে চামড়ায় জ্বলুনি ধরিয়ে দেয়। এই হঠাৎ ঘষামাজায় শরীরের কালশিটে কয়রাগুলো সামান্য সাদাটে হয়ে ওঠে।

আজ বাসনা-সাবানের চিলতাটা খুঁজে পেতে হয়রান হয়ে গেল ছোরমান শেখ। সাবানের ভুরভুর গন্ধে তালাপের পাড় ম-ম করবে না! অবশ্য ভাগ্য প্রসন্ন হলে সে হয়তো দুলুমিয়ার দেখা পেয়ে যাবে। মনোয়ারার খিঁচড়ে মেজাজকে দুলুমিয়াও ভয় পায়। মায়ের মেজাজ তেতে ওঠার আঁচ পেলেই সে পগারপার। আসলে উত্তম-মধ্যম খাওয়ার ভয়ে তাকে সটকে পড়তে হয়। মনোয়ারা রেগে গেলে হুঁশজ্ঞান একেবারে হারিয়ে ফেলে।

ছোরমান শেখ সাবান খুঁজে বৃথা সময় নষ্ট করল না। ময়লায় রং পালটে যাওয়া গামছা আর তবন কাঁধে ফেলে তালাপের পথ ধরল। আজকাল হাঁটতে হাঁটতে তার শরীর ভেঙে আসতে চায়। কোথায় যেন বড়সড়ো নটরবটর হয়েছে। হাঁটতে গেলে মাথা আপনা-আপনিই মাটিতে নুয়ে আসে। শিরদাঁড়ার সেই টানটান অনুভবে জং ধরেছে সেই কবে! হাঁটুতে টান দিয়ে বয়স যেন জানান দিয়ে যায়—

‘অনেকখানি পথ হেঁটেছ বাপু, এবার একটু ক্ষান্ত দাও না।’

মনোয়ারা কারণ-অকারণে বিগড়ে গেলেই ছোরমান শেখকে সমস্যার মুখোমুখি পড়তে হয়। মনোয়ারার গোঁয়ারতুমির বেড়া ডিঙিয়ে এগোনো তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মন ভালো থাকলে শ্বশুরের সেবাযত্নের ত্রুটি সে

কোনভাবেই করে না। বালতিতে জল ধরে রাখা, তেল-তবন এগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। আজ সেসব সম্ভাবনা শূন্য।

ছোরমান শেখ পথ চলতে পায়ে হাজারটা ঠোক্কর খেয়ে তালাপের কাছে চলে এল। যত কষ্টই হোক ভরভরন্ত তালাপের কাছে এলে মনটা জলজ হয়ে ওঠে। ঘোলা চোখে জীবনের ছবি আঁকতে আঁকতে সব রং ফুরিয়ে যায়।

তরতাজা পিটকুলি গাছটা জলের হিমহিম ভাব বাড়িয়ে দিয়েছে। ডালপালাকে যতটা সম্ভব মেলে দিয়ে যেন আকাশটা ছোঁয়ার ইচ্ছেটাকে প্রচ্ছন্ন করে তুলেছে। গাছের মোটাসোটা গুঁড়ি ঘেঁষে ছিটকি-ঝোপ পার হলে, আধশোয়ানো বইন্যাগাছ। ছোরমান শেখ একটা রহস্যের কূলকিনারা খুঁজে পায় না। অবস্থার চাপে পড়ে যখনই সে তালাপের পাড়ে আসে, এক জোড়া বুকসাদা মাছরাঙা দম্পতিকে বসে বসে ঝিমুতে দেখে। কী অদ্ভুত! তারা ঝিমুতেই থাকে। ঝিমুতেই থাকে। মাছের খোঁজে একদিনও ঝাঁপাঝাঁপি করে না। তাহলে পেট ভরায় কী দিয়ে?

বর্ষাকাল বলে তালাপের চৌহদ্দি ছেড়ে জল কিছুটা আগ বেড়েছে, অবশ্য বেশিদূর গড়ায়নি। ছিটকি ঝোপেই হাঁটু গেড়ে বসেছে। ছোরমান শেখের আজকাল বড় ভয় করে। বয়স হয়েছে। চোখের নিষ্প্রভ-জ্যোতি তাকে বড় ভাবনায় ফেলে দেয়। কোনদিন যেন পা হড়কে ভরা জলে খাবি খায় বুড়ো! দুলু মিয়ার খোঁজে সে এদিক-সেদিক বার কয়েক তাকাল। না, সে এখনও লাপাত্তা। মাছরাঙা দম্পতি এক পলকের জন্য ডানা ঝাড়ল। আবার ঝিমুনির চাদরে মাথা এলিয়ে দিল। তালাপের কাছাড় বেয়ে বড় সাবধানে কোমর জলে নামল ছোরমান শেখ। মাথার চান্দি ভালো করে না-ভিজিয়ে দুইখান ডুব দিল। মাত্র অর্ধডুব। এতেই তার মনে হলো সাত সমুদ্দুরের তলদেশে মাথা গলিয়েছে। হাঁসফাঁস করে দ্রুত তালাপের পাড়ে উঠে এল। আসলে রুইমাছের সালুন তাকে অস্থির করে রেখেছিল। তাড়াহুড়ো করে ছিটকিঝোপ পেরিয়ে আসার সময় পায়ের নিচে জলের ছলাৎ ছলাৎ ধ্বনি উঠল।

চৌধুরীদের তালাপের সীমানা শেষ হলে পায়ে চলার পথ। পথের দুপাশে ঘেসো জমি। জমিনের বুকের ওপর পথ সুতানলি সাপের মতো এঁকেবেঁকে গেছে। বর্ষাকালে পুরো পথই খিতখিতে কাদাতে ডুবে থাকে। এ কারণে তালাপে নাইতে এলে ছোরমান শেখ বিরস মুখে বাড়ি ফেরে। জলকাদার প্যাঁচপ্যাঁচানি দলে এসে গোসলের তৃপ্তিটুকু আর থাকে না। পায়ের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে জলকাদা ঢুকে কদিনেই কাদাখেকো ঘা ধরিয়ে ফেলে। আজ এতসব ভাববার সময় তার একেবারেই নেই। ছোরমান শেখের নিষ্প্রভ-চোখে গাবদা গাবদা মাছের টুকরোগুলো দৃশ্যমান কেবল।

বাড়ির আঙিনায় মুলিবাঁশের আড় বাঁধা। ভেজা তবন আর ত্যানা হয়ে যাওয়া গামছাখানি তাতে কাঁপা হাতে ছড়িয়ে দিল শেখ। ঝুলো চামড়ার ভেতর থেকে চোখদুটো টেনে বের করে দেখার চেষ্টা কর রোদের উনুন ঝিমিয়ে পড়েছে কি না। চোখের আলো ক্ষীণ হয়ে এসেছে বলে সময় বুঝতে বেশ অসুবিধা হয়। দিন বা রাতের পহর সে অনুভবের ঘড়িতেই দেখে নেয়। মধ্যদুপুরে রোদের উনুন গনগনে থাকে। তাপের যে বিকিরণ ঘটে তা তার অসংখ্য আঁকিবুঁকি কাটা চামড়া ঝলসে দিতে চায়। ছোরমান শেখ বুঝতে চাইল বেলা এখন কোন দিকে? মসলিন মিহি-উত্তাপ-তাকে বিদ্ধ করছে। তার মনের উনুনে এখন কমলা রঙের ম্লান-আলো ছড়িয়ে আছে।

নিঃশব্দে বাড়ির স্যাঁতসেঁতে উঠোন পেরিয়ে এল সে। বারান্দার জলচৌকির ওপর বসে ভালো করে দম নিয়ে অনর্থক গলাখাঁকারি দিল। আসলে সে জানাতে চাইল, খিদে পেয়েছে। না-কারো কোনো সাড়াটাড়া নেই। সবাই গেল কোথায়? মিনিট পনেরো পর দুলুমিয়া হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে হাজির হলো। তাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না-দিয়ে হাত ধরে টানাটানি শুরু করল—

'ও দাদা-দাদা, ওডো। ভাত খাওন লাগব না? মায়ে রুইমাছের সালুন রানছে। এত্ত দেরি করলা! ক্ষিদায় আমার পেড পইরা রইছে, দেহ।'

দাদার খরখরে হাতদুটো টেনে নিয়ে পেটে রাখে দুলু। ছোরমান শেখ হাত সরিয়ে নেয়। ইচ্ছে করেই গাঁট হয়ে বসে থাকে। ভাবখানা—'বান্দুর ছ্যামরা, এত্ত বেলা কই আছিলি?'

অবশ্য দুলুমিয়ার কাছে সে বেশিক্ষণ ভাব ধরে থাকতে পারে না। খিদের তাড়নায় তারও পেটের নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে আসছিল। তবুও যাই-যাচ্ছি করে আরো খানিকটা গড়িমসি করল। আসলে এই দেরির অবসরে মনোয়ারার মেজাজের রকমসকম আন্দাজ করেত চাইছিল। বউটাকে বা কত দোষ দেবে? স্বামী যার বাউন্ডুলে, তার মনে আর যাই থাকুক সুখ থাকার কথা নয়। একমাত্র সন্তানটি কেন যে বিবাগী হলো! বাবা হয়েও সে জানে না। প্রথম প্রথম সব ভালোই ছিল। চাঁদের কণা দুলুমিয়া জন্মাল। তখন থেকে আরমানের ছন্নছাড়া মতিগতি। দুলুমিয়ার আধোআধো বাপু-ও বাপু-বাপজান ডাক আরমানকে ঘরমুখো করতে পারেনি। ছেলের ঘরে ফেরার আশা ছোরমান শেখ বলতে গেলে একরকম ত্যাগই করেছে। বারুনীর মেলা জমে উঠলে আরমান বাড়ি আসে। বছরে এই একবার ছাড়া আরমানের দেখা পাওয়া ভার। ওই কয়টি দিন দুলুমিয়ার ঈদ-ঈদ-দিন। মাটির ঘোড়া, চরকি, লেজওয়ালা-ঘুড়ি পেয়ে সারাবছর বাপজানকে কাছে না-পাওয়ার যাতনা সে ভুলে যায়। আরমানও ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু কদিন যেতে-না-

যেতেই পুরনো রোগ পেয়ে বসে। তখন সে সংসার ছেড়ে পালায়। কখনো মনে হলে সামান্য সামান্য টাকাকড়ি পাঠায়। সে যে কী করে বা কোথায় থাকে ছোরমান তাও সঠিক বলতে পারে না। স্বামীর ভবঘুরে জীবন, নিত্য অভাব-অনটনের সাথে ধাক্কাধাক্কিতে মনোয়ারা বিমর্ষ থাকে। মেজাজের ঝাঁজে বুড়ো শ্বশুরকে প্রায়ই পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে চায়।

খেতে বসে ছোরমান শেখের সকালের সেই বিশ্রী ঘটনাটা সত্যিই মনে রইল না। মাটিতে সপ বিছিয়ে যত্ন করে দাদা-নাতির পাত সাজিয়েছে মনোয়ারা। আউশের হিজল-হিজল-ভাত আর রুইমাছের মাখামাখা সালুন, কাঁঠালবিচির-ভর্তা, পাতলা-ডাল। বউয়ের রান্নার হাত বড়ই চমৎকার। মাছের ঝোল দিয়ে কয়েক লোকমা ভাত মুখে তুলতেই পেটের ভেতর গুটুরমুটুর শুরু হলো। কিন্তু রুইমাছের পেটিদুটো তার দিকে যেভাবে ফটফট করে তাকিয়ে রইল, তাতে পাত ছেড়ে ওঠা আর সম্ভব হলো না। ডালের তলানিটুকু কাত করে ঢেলে নিয়ে দুলুমিয়ার দিকে আড়চোখে তাকাল। দুলুমিয়া নিজের খাওয়া ভুলে অবাক হয়ে দাদার খাওয়া দেখছে। মনোয়ারা হাঁড়ির তলা কেচে কোনরকম এক মুঠো ভাত ছেলের পাতে ফেলে দিল—

'বাবা আইজ আর ভাত নাই। এইটুকু খাইয়া ওডো।'

ছোরমান শেখ একমনে খেয়ে যাচ্ছিল। মনোয়ারার কথা শুনে মাথাটা নিচু করে হাঁটুর ফাঁকে আরেকটু গুঁজে দিল। পেটের এক কোনা এখনও অপূর্ণ পড়ে আছে। সে কী করবে? ছেলের বউটা হয়তো আজ দুপুরেও উপোস দেবে। হরহামেশাই ত এমন ঘটে। ছোরমান শেখের কী দোষ? খাওয়া সামনে পেলে তার পেটের ভেতর জন্মের রাক্ষস হাঁ করে থাকে। ডালের শেষ তলানিতে সুড়ুৎ করে চুমুক দিতেই পেটের গুটুরমুটুর তাকে অস্থির করে তুলল। আর মনোয়ারা কিনা সময় পেল না। সকালের সেই অপ্রিয় ঘটনাটা তখনই পেরে বসল। মনের তেতো ভাব তার কণ্ঠেও ফুটে উঠছিল—

'আতরজানরে নাহি আফনেই কইছেন? হাছাই কইছেন? কেন কইলেন? এত্ত বেলাহাজ কেমনে হইলেন?'

জিভে তখনও মাছের চমৎকার স্বাদ, দাড়ির জঙ্গলে ডালের হলুদ-কণা লেগে আছে— ছোরমান শেখ মনোয়ারার কথার জবাব দেবে সে অবস্থায় একেবারেই ছিল না। আসলে যত ঝামেলার মূলে সে নিজে। বয়স যত বাড়ছে, ভালো ভালো খাবারের আকাঙ্ক্ষা তাকে কাতর করে তুলছে। অবশ্য সে নিজে খুব বেশি দোষ করে ফেলেছে বলেও তার মনে হয় না। আতরজান দূরসম্পর্কের নাতনি—তার কাছে চাইলে বড়সড়ো দোষ হয়, এটা তার মাথাতেই আসেনি। অবস্থাসম্পন্ন ঘরে আতরজানের বিয়ে হয়েছে। বাপের

বাড়িতে নাইওর এসেছে কদিন হলো। ছোরমান শেখ ত বুঝেশুনেই তার কাছে মাছ খাওয়ার ইচ্ছেটা জানিয়েছিল। সেটাই কাল হলো! মনোয়ারা কারো কাছে চেয়েচিন্তে খাওয়ার কথা ভাবতেও পারে না। না-খেয়ে মরে গেলেও না। অভাবের আগুন তাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাঁটি করেছে। মাছটা যখন আতরজান হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল, তখন থেকে মনোয়ারা ক্ষেপে আছে। মনোয়ারা কণ্ঠকে সামান্য নরম করে আবারও জিজ্ঞেস করল—

'আব্বা কতা কন না কেন? আপনে নাহি মাছ খাইতে চাইছেন?'

পেটের ভেতর গুড়গুড়ানি তখন চরম পর্যায়ে। মনোয়ারার কথা কোনমতে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ছুটল কুয়াতলায়।

শুকনা কলাপাতার আড়ালে পেটের গুড়গুড়ানি চেপে ধরে বসে পড়ল।

সারাবাড়ি ঘুরে ঘুরে দুলুমিয়া দাদাকে ডাকাডাকি করল। তার কচি কণ্ঠ কতদূরই-বা পৌঁছতে পারে! দাদার সাড়া না-পেয়ে অগত্যা সে তালাপের ধারে চলে এল। দুলুমিয়ার অনুসন্ধানী চোখ চঞ্চল হলো। ছিটকিঝোপের হাঁটুজলে ছোরমান শেখ তবন ভিজিয়ে বসে আছে। হয়তো তালাপে নামার সাহস পায়নি। দাদার দেখা পেয়ে দুলুমিয়া ছপছপ পানি ভেঙে চলে এল ছিটকিঝোপে। দুলুমিয়ার অবয়ব আন্দাজ করে ছোরমান শেখ তাকে ইশারায় চুপ করে থাকতে বলল।

'ও দাদা—দাদা—কী ওইখানে?'

'ওই বান্দর চুপ থাক।'

'ক্যা? তুমি না একবার নাইয়া গেলা? আবার আইছ ক্যান?'

'তরে না কইলাম চুপ থাক!'

'ক্যান?'

'পিটকুলি ডাইলে দেখ।'

'কী দেহুম—নয়া কিছু আছে নাহি?'

'আরে দেহস না।'

দুলুমিয়া তাকিয়ে দেখে তেমন বিশেষ কিছু না। কেবল তিন জোড়া মাছরাঙা লাবণ্য ছড়িয়ে নিচু ডালে বসে আছে। তাদের রংচঙা পালকের ঔজ্জ্বল্য তালাপের পানিতে গলে পড়ছে। ছোরমান শেখ বিস্মিত হয়ে দেখল দুটো মাছরাঙা উড়াল দিয়ে পানিতে ছোঁ মারল। পরক্ষণে যখন পিটকুলি ডালে উড়ে এল, তখন মাছরাঙার ঠোঁটে বিঁধে আছে লম্বাসম্বা কাকিলা মাছ।

কতদিন ওদের খেয়াল করেছে, কিন্তু মাছ ধরতে দেখেনি। মাছরাঙাবিষয়ক চিন্তা দুলুমিয়ার প্রশ্নে খেই হারালো।

‘দাদা— এহানে এতক্ষণ করো কী?’

‘পক্ষী দেহি।’

‘পক্ষী কি নয়া দেহ নাহি?’

‘দেহস না আইজ আবার হেগো দুই জোড়া কুটুম আইছে।’

‘কুটুম না অন্যকিছু কেমনে জানলা?’

‘ওই যে কুটুম আইছে বইলা দুইজনে মাছ ধরবার লাগছে।’

‘তাতে তুমার কী?’

‘কিচ্ছু না। ভালোমন্দ খাইতে বেক্কের মন চায়।’

‘ঘোড়ার আন্ডা—হেগো খাওনই তো মাছ।’

‘তাইলে এতদিন ঝিম পারবার নাগছিলা ক্যা!’

‘কী যে কও, মাতামুণ্ডু বুঝি না।’

‘বুঝন লাগব না। তুই বাড়িত যা।’

‘না তুমিও একনগে নও। পানিতে বইয়া রইছ যে! জ্বর বান্দাইবা? পানিতে বইছ ক্যা? তবন নষ্ট করছ নাহি?’

‘ই-কেমনে কেমনে হইল বুঝলাম না। সামলাইবার পারি না।’

‘মায়ে তুমারে দিবনি। পেড ছুড়ে তো অত খাও ক্যা? কম কম খাইবার পারো না!’

‘তর মারে কইস না।’

‘আইচ্ছা কমু না। এইবার নও যাই।’

ছোরমান শেখ ছিটকিঝোপ থেকে উঠে এলে উৎকট গন্ধে বাতাস ভরে যায়। দুলুমিয়া আঙুলে নাক চেপে ধরে। গা গুলিয়ে বমি আসত চায়। কিন্তু দাদার জন্য দুলুমিয়ার প্রচণ্ড মায়া। নাকে আঙুল চেপে নাকিনাকি করে বলে—

‘বুইড়া কঁরছে কী? মাঁয়ে দেঁখলে তুঁমারে আঁর আঁস্ত থুঁইব নাঁ।’

ছোরমান শেখের হাত ধরে দুলুমিয়া যখন বাড়ি পৌঁছুল বাদামি বিকেল তখন কাত হয়ে বাঁশের আড় জড়িয়ে ধরেছে।

তোমরাও ত পিঞ্জিরার পাখি নাহি থাক বনে।
তোমরা তাহার কথা ভুলিলা কেমনে॥
ক্ষীর-সর দিয়া পাখি পালিল যে জন।
কেমনে তাহার কথা হইলে বিস্মরণ॥
এত যে বাসিয়া ভালো পালিল সকলে।
কী বলিয়া গেল বঁধু যাইবার কালে॥
কোন দেশে যাবেরে বলি কহিল ঠিকানা।
অবশ্য তোমাদের পাখি কিছু আছে জানা॥

মনোয়ারার গুনগুন সুর প্রতিদিনের বিকেলের রেখা ধরে স্পষ্ট হয়। সেই কবে লীলা আর কঙ্কের পালাগান দেখেছিল। আরমান তখনো সংসারে। বউকে নিয়ে পালা দেখে এসে সে কী উচ্ছ্বাস! মনে হলে মনোয়ারা এখনও লজ্জা পায়। লীলার মতো দুঃখই যখন অহর্নিশ সঙ্গী হলো, তখন থেকে এ গান মনে বেঁধেছে। মনোয়ারা যখন এ গান গায়, ছোরমান শেখ দুই চোক্ষের পানি ছেড়ে দেয়। সে তো ভালো করে জানে স্বামী যাকে ফেলে দূরে চলে যায়— তার দুঃখপাখি অন্য আকাশে উড়াল দিতে পারে না। পাখিটার ডানা দুটো যে কাটা পড়েছে।

দুলুমিয়ার হাত ধরে শ্বশুরকে ঘরে ঢুকতে দেখে মনোয়ারার সুর থেমে গেল। সদ্য ভেজা তবন। তবন থেকে তখনো ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছিল। মনোয়ারার তীক্ষ্ণ চোখ পলকেই অবস্থা আন্দাজ করে নিল। বুইড়ার হাভাতে স্বভাব। মনোয়ারা এজন্যে খুব বিরক্ত হয়। খাওয়া পেলে হাপুসহুপুস খেতে থাকে। তারপর শুরু হয় যতসব অনাসৃষ্টি।

'তবন নষ্ট করছেন না? করছেন ভালো কথা। অবেলায় তালাপে গেলেন ক্যান? হাত-পাও ভাঙবার চান?'

ছোরমান শেখ তোতলাতে থাকে—

'আ-সলে বুঝ-লা না বু-ঝ-বার পারি নাই।'

'বয়স বাড়তাছে। হুঁশজ্ঞান কইরা তো খাইবেন না!'

ছেলের বউয়ের ছুড়ে দেয়া গুলতির সম্মুখে সে অসহায় দাঁড়িয়ে থাকে। লজ্জায় মুখ আপনা আপনিই ঝুলে পড়ে। মনোয়ারা বুড়োর কাণ্ড-কারখানায় সত্যিই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। দুইখানা মাত্র তবন। দুইখানই ভিজাইল! বুইড়া এহন পরব কী?

বুইড়ারে নিয়া আর পারা গেল না। মনোয়ারা পুরনো কাপড়ের গাট্টি খুলে দুই-তিন জায়গায় ভোগলা হয়ে যাওয়া বাতিল একটা তবন বের করে দেয়। রোদ আর জলে যার সঠিক রং চেনা এখন দুঃসাধ্য। দুলুমিয়ার হাতে তবন দিয়ে শ্বশুরকে উদ্দেশ্য করে বলে—

'যান চপচপা ভিজা তবনটা বদলাইয়া ফালান। জ্বরজ্বারি হইলে তো আমারই মরণ।'

ছোরমান শেখের মুখে আর কথা জোগায় না। কুঁজো হয়ে পরনের তবনটা মাটিতে ছেড়ে দেয়। ভুশ করে সেই উৎকট গন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে। বাঁ-হাতের দুই আঙুলে তবনের কোনা ধরে কুয়োতলায় যেতে যেতে মনোয়ারা বমি করে ফেলে। বমির বেমক্কা ধকল সামলে ঘরের দিকে হুঁশিয়ারি ছুড়ে দেয়—

'রাইতে আর খাওনের নাম করবেন না। পদগদাইয়া খাইবেন আর জ্বালাতন করবেন আমারে।'

মনোয়ারার নিষেধ শুনে শেখের কলিজার ভেতর ছ্যাঁৎ করে ওঠে। তার মানে মাছের সালুনের বাদবাকি ভাগ আজ আর তার কপালে জুটবে না? অথচ কত ইনিয়েবিনিয়েই না সে আতরজানের কাছে মাছ খাওয়ার হাউসের কথা পেড়েছিল। মনোয়ারা কেন যে এত পাষাণী!

রংজ্বলা-ভোগলা-তবন আর ত্যানা-ত্যানা গামছাটা নিয়ে ছোরমান শেখ তৃতীয়বার যখন তালাপে এল, তখনো সন্ধ্যাআলো চরাচরে বিছিয়ে ছিল। সেই ম্লান আলোতে তিন জোড়া মাছরাঙা উল্লাস করে মাছ ধরছিল। ধরছিল আর টপাটপ গিলছিল। সারারাতের জন্য তাদের পেট ভরানো দেখে ছোরমান শেখের মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল। মনোয়ারা আজ তাকে কিছুতেই খেতে দেবে না। না-খাওয়ার কথা ভাবতেই শরীরজুড়ে ঝিমঝিমানো অবসাদ। শক্ত একটা ছিটকিগাছ ধরে কোমর পর্যন্ত কষ্টেমষ্টে ধুয়ে নিল। বাড়ির পথে এগোতে দুই-তিন বার হুমড়ি খেলো। হামাগুড়ি দিয়ে যখন সে বাড়ির আঙিনায় পৌঁছাল তখন আর চরাচরে আলোর আভা ছিল না। মনোয়ারার বিরক্তিমাখা মুখ দেখতে তার কেন যেন আজ ভারি সংকোচ। বাঁশের আড়ে ঠেস দিয়ে চুপচাপ অজানা অন্তহীন ভাবনায় ডুবে গেল।

জোনাক জ্বালিয়ে রাতের আরতি শুরু হয়েছে অনেকক্ষণ। ব্যাঙের ঘ্যাঁ-ঘ্যুঁ আর ঝিঁঝির ডাক কানে তালা ধরাল। তখনো কেউ তাকে খুঁজতে এল না। প্রচণ্ড অভিমানে ছোরমান শেখ চালাঘরের বারান্দায় উঠে এল। দুলুমিয়ার কচি কণ্ঠের ডাকের জন্য সে অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। দুলুমিয়া অন্তত দাদাকে না ডেকে খেতে বসবে না। ভেজা-কাপড় শরীরে লেপ্টে থাকার কারণে সে সামান্য সামান্য কাঁপছিল। মনোয়ারা বা দুলুমিয়া সত্যি কেউ তাকে ডাকতে এল না! হয়তো মা-বেটা মিলে অনেকদিন পর আজ রাতে পেট পুরে ভাত খাবে...

টগরফুলের মতো ধবধবে-সাদা জোছনা নেমেছে। সেই সাদা-সুগন্ধি জোছনা গায়ে মেখে হাতদুটো পেটে জড়ো করে ছোরমান শেখ শুয়ে রইল। তিনবার তালাপে যাওয়ার কারণে নাকি মনের ক্লান্তিতে সে কেন যেন জেগে থাকতে পারছিল না। ঝুলো চামড়ার নিচে চোখজোড়া আপনা আপনিই বুজে আসছিল। কিন্তু তন্দ্রা বা ঘুমের ভেতর থেকেও সে হঠাৎ চমকে উঠছিল। দুলুমিয়া প্রচণ্ড রকম দাদার ন্যাওটা। সে হয়তো কয়েকবার তাকে ডেকে গেছে। ঘুমঘোরে ডাক হয়তো সে শুনতে পায়নি। এরকম বিভ্রমে সে অনেকটা জোর করেই জেগে থাকতে চাইল। আর কেউ না জানুক দুলুমিয়া